জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ : সরকার, আইন ও মানব অধিকার

নিরঞ্জন হালদার

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা — তিন মহাদেশের বিভিন্ন দেশে কৃষকেরা কৃষিজমি ও আদিবাসীরা জমি ও বন থেকে উৎখাত হচ্ছে। এই উৎখাত বিশেষ এক ধরণের উন্নয়ণ - পদ্ধতির জন্য এবং তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা - নিরপেক্ষ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো কম্যুনিস্ট চীনেও একই ধরণের ব্যাপার ঘটছে। চীনে জমির মালিক সরকার হলেও কৃষকেরা জমিতে চাষবাসের অধিকার বজায় রাখার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ করছে, সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃষক ও আদিবাসীরা জমি ও বনের ওপর অধিকার বজায় রাখতে একইভাবে সচেষ্ট। সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দেশে দেশে আন্দোলন এত ব্যাপক আকার ধারণ করছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব অধিকার কমিশন জমিহারাদের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছে। প্রমাণ 'ফোর্সড এভিকশান অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস' পুস্তিকা। এই পুস্তিকা থেকে জানা যায়, বর্তমানে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে কমপক্ষে এক কোটি লোক জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে। এখন আর কেউ সরকারি আদেশে জমি ও বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছে না। সিঙ্গুর - নন্দীগ্রাম, ওড়িশার মতো অন্যত্রও জীবন ও জীবিকার অধিকার বজায় রাখার জন্য সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে জবরদস্তির সাহায্যে জমি কেড়ে নেওয়া বন্ধ করার উদ্দেশে রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব অধিকার কমিশন স্পেশাল র‍্যাপোরট্যুর নিয়োগ করছে, যাঁর কাজ হবে সরেজমিনে তদন্ত করে মানব অধিকার কমিশনের বিভিন্ন কমিটিকে জানানো।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমি থেকে উৎখাত করার জন্য স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আদেশই যথেষ্ট। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতে সরকার 'জনস্বার্থের' দোহাই দিয়ে আইনের সাহায্যে জমি অধিগ্রহণ করে থাকে। এই আইনের জমির মালিকের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বনাঞ্চলের জমিতে বসবাস ও চাষবাস করেন, এমন ব্যক্তিদের নাম সরকারি নথিতে থাকলে তাঁরও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। এই আইন তৈরির একটি ইতিহাস আছে। ১৮৮০ -র দশকে গোটা উত্তরভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে লোকের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার দুটি কর্মসূচি নেয়। — রেলপথ নির্মাণ ও সেচ-খাল করা জেমিন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৮৯৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইন পাস ও চালু করে। এই আইনের সাহায্যে ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যে জমি অধিগ্রহণ করতে কত খাল কেটেছিল, তার বিবরণ মিলবে লেডি হোপ রচিত 'জেনারেল স্যার আর্থার কটন' বইটিতে। ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)' বইটি ১৯৬৮ সালে পুনর্মুদ্রণ করে। জন কেনেথ গ্যালব্রেথ তাঁর 'দ্য নেচার অফ ম্যাস পর্ভার্টি' (১৯৭৯) বইতে উল্লেখ করেছেন যে, দুর্ভিক্ষের ত্রাণকাজ হিসাবে কাটা দীর্ঘ সেচব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। এই আইনের সাহায্যে জমি অধিগ্রহণ করে অল্প খরচে ভারতীয় রেলপথ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। ('much Indian railboard building was a famine relief measure.'গ্যালব্রেথ, ঐ পৃঃ ৫৭) যাই হোক, ১৯৫০ সালের আগে এই আইনের প্রয়োগ তত ব্যাপক ছিল না। রেল লাইন সম্প্রসারণ, সড়ক নির্মাণ, বন্দর, বিমানবন্দর, সরকারি অফিস, হাসপাতাল, সরকারি শিল্পসংস্থার জন্য সরকার এই আইনে জমি অধিগ্রহণ করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক সেনানিবাস, সামরিক বিমানবন্ধর প্রভৃতির জন্য জমির প্রয়োজন মেটাতে এই আইন প্রয়োগ করেছিল। তখন বেসরকারি শিল্পসংস্থাগুলিকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করতে হত। হাওড়ার দাশনগর আলামোহন দাশের ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিণতি, সরকার জমি অধিগ্রহণ করে তাঁকে সাহায্য করেন নি।

১৯৫০ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প, শিল্প ও শিল্পনগরী, উপনগরী, বন্দর, বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ, মিটারগেজ রেলপথকে ব্রডগেজে রূপান্তর, হাসপাতাল, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই আইনটি সংশোধন করেছে। ১৯৬৪ মাসে কেন্দ্রীয় আইন সংশোধন করে ৩১এ ধারা যোগ করা হয়েছে, জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনের কম জমি মালিক চাষবাস করে, তা হলে সেই জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। সেই জমিতে যদি বাড়ি, কুঁড়েঘর থাকে, তাহলে বাজার দর দিয়েই ঐ জমি কিনতে হবে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও বহুবার আইনটি সংশোধন করেছে। যেমন, মহারাষ্ট্রে অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তির পর দু বছরের মধ্যে জমির দান না দিলে বিজ্ঞপ্তি বাতিল হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গেও এই আইন বহুবার সংশোধিত। হাওড়া, কলকাতা প্রভৃতি শহর এলাকায় শহর উন্নয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা লাভ এবং কৃষিজমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বর্গাদারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার শর্ত যোগ করা হয়েছে। সরকার জনস্বার্থের নামে জমি অধিগ্রহণ করে কোনো বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দিতে পারে। অতীতে বিড়লাদের হিন্দুস্থান মোটর্সের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে 'লিজ' দিয়েছিল, রাজ্য সরকার সেই জমির অব্যবহৃত অংশ বহুবছর পরে ২০০৮ সালে রিয়েল এস্টেটের বাড়ি করার জন্য বিক্রি করেছে। বামফ্রন্ট সরকার ২০০৬ সালে সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে টাটা মোটরসকে এক গোপন

শর্তে লিজ দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সালিমের কোম্পানির জন্য নন্দীগ্রামে, বনগাঁ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা হয়ে হলদিয়া যাওয়ার জন্য চার লেনের সড়ক, স্বাস্থ্যনগরী, উলুবেড়িয়ায় মোটর বাইক তৈরির কারখানা স্থাপনের জমি গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিল বা জমি অধিগ্রহণ করেছে। ভারত সরকারের তফসিলি জাতি ও উপজাতি কমিশনার ডঃ বি. ডি. শর্মা কমিশনের ২৯তম রিপোর্টে (১৯৮৭-১৯৮৯) প্রশ্ন তুলেছিলেন, জনস্বার্থ বলতে কী বোঝায়? কারা ঠিক করে প্রকল্পটি জনস্বার্থ কিনা, স্থানীয় মানুষের মতামত নিয়ে প্রকল্পটি জনস্বার্থের কিনা বিবেচনা করা হয় কিনা। কমিশনার ডঃ শর্মা তাঁর রিপোর্টে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ঃ প্রকল্পটি জনস্বার্থ কিনা তা ঠিক করেন রাজনৈতিক নেতারা, কখনও অফিসার ও ইঞ্জিনিয়াররা। এখন আবার ভারতের নতুন অর্থনৈতিক নীতি অনুসারে পরিকাঠামোতে জনস্বার্থ কার্য করার শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমে বিদেশি মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার জন্য। সেজন্য, চার-ছয়-আট লেনের সড়ক, সেতু, বিমানবন্দর, উপনগরী, রিয়েল এস্টেট, পর্যটনকেন্দ্র, স্বাস্থ্যনগরী পরিকাঠামো শিল্প হিসাবে গণ্য। তাই এখন শিল্পোন্নয়ন বলতে আর কলকারখানা বোঝায় না। সড়ক, সেতু, উপনগরী, স্বাস্থ্যনগরী, শিল্পনগরী, হাসপাতালও বোঝায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার নির্ধারণে এসবের অবদান সরকারের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশে ২০০৫ সালে চালু করা 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' বা 'সেজ' প্রকল্প সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। দেশি ও বিদেশি শিল্পসংস্থা কোনো কারখানা বা অন্য ধরণের শিল্প স্থাপন করতে চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার সেটিকে 'সেজ' এলাকার শিল্প হিসাবে ঘোষণা করেছে। সেই শিল্প - এলাকায় ভারত সরকারের শ্রম - আইন কার্যকর হবে না, নানা ধরণের কর দেওয়া থেকেও রেহাই পাবে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দাল কোম্পানির ইস্পাত কারখানার বিরুদ্ধে, ওড়িশায় পাস্কো কোম্পানির বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ও ওড়িশায় জমি অধিগ্রহণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শাসক দলের প্রার্থীদের পরাজয়ের ঘটনা আমরা জানি। মহারাষ্ট্রে রায়গড় জেলায় 'সেজ' স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসী মন্ত্রী এর-আর আন্তুলে। সেজ - বিরোধী আন্দোলনের জন্য লোকসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন এবং বিজ্ঞপ্তির দু বছরের মধ্যে জমির দাম না মিটিয়ে দেওয়ায় বোম্বে হাইকোর্টের রায়ে কৃষকরা তাঁদের জমি অধিকারের নিরাপত্তা ফিরে পেয়েছে। বিশেষ এলাকায় রপ্তানি - পণ্য উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সব 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন' স্থাপন করেছিল, সেগুলিকে সেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় চারশোর মতো 'সেজ' প্রকল্প ভারত সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য সরকার কৃষিজমি ও বনাঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ করছে এবং সবই জনস্বার্থ ও শিল্পোন্নয়নের নামে। কৃষক ও আদিবাসীরা জমি অধিগ্রহণে আপত্তি জানালেই তাঁদের বলা হচ্ছে উন্নয়ন-বিরোধী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এই প্রচার গিলেছেন। ডঃ শর্মা কমিশনের ২৯তম রিপোর্টে এই ভাবনার মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন ঃ সংগঠিত শিল্প দেশের মানুষের মনে গুরুত্ব পেয়েছে দুটি কারণে। উন্নয়নের বর্তমান ধারা অনুসারে সংগঠিত আধুনিক শিল্পের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সুতরাং ঐ সব শিল্পসংস্থার মালিকেরা দেশের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন, এমন একটি ধারণা লোকের মনে চেপে বসেছে। দুই, সরকার, সংবিধান, আইন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠিত শিল্পের অংশ হয়ে গিয়েছে। এ বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় শিল্পপতিদের পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং বাজেট পাসের পর আবার তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বড়লোক করদাতাদের কর থেকে নানারকম রেহাই দিয়েছেন। অথচ আমজনতার উপর নানারকম বোঝা চাপিয়েছেন।

ডঃ বি. ডি. শর্মা তাঁর রিপোর্টে আরও বলেছেন, সংগঠিত শিল্পকে দেশের উন্নতির প্রধান ভূমিকা হিসাবে গণ্য করায় লোকের মনে অসংগঠিত শিল্পসংস্থা, কৃষি, বনসম্পদের ভূমিকা একেবারেই অবহেলিত। কিন্তু দেশের সংগঠিত শিল্পে শতকরা কতজন শ্রমিক কাজ করে? রবীন্দ্র বর্মা কমিটির রিপোর্ট অনুসারে মাত্র ৭ শতাংশ, এই ৭ শতাংশের জন্যই যত শ্রমিক আইন, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনশন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি। বাদবাকি ৯৩ শতাংশের মধ্যে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের শ্রমিক, কৃষি-কর্মে নির্ভর, বনের জমি ও বনসম্পদের কর্মী, দোকান-কর্মচারী, ঠিকাদার নিযুক্ত প্রহরী, গাড়ির চালক, অন্যান্য পরিষেবা কর্মীরাও আছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের কথা শুনিয়ে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের 'সেজ'-এ নানা ধরণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের গুরুত্ব কতটা? অর্থনীতিবিদ ডঃ অমিত ভাদুড়ী গত ২৬ আগস্ট দিল্লিতে ডি. এম বোরকার স্মারক বক্তৃতায় বলেছেন, 'ভারতের কর্পোরেট সেক্টরে মোট শ্রমিকের ৩ থেকে ৪ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে।' যাদের কাছে ভারত সরকার, এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সবসময় নতজানু, ভারতীয় অর্থনীতি তাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। ডঃ ভাদুড়ী আরও বলেছেন, 'এরা ঠিকাদারি প্রথার মাধ্যমে কাজ করাচ্ছে। এই ঠিকাদারের কোনো শ্রমিক - আইন মানে না এবং বেশি সময় খাটিয়ে কম বেতন দেয়।' (দ্য স্টেটসম্যান, ২৭ আগস্ট, ২০০৯)

এখন আপত্তি এত বেশি কেন?

১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনে আপত্তি আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। প্রথমত কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। উৎখাত হওয়া ব্যক্তিরা অন্যত্র বসবাস ও কাজের সুযোগ পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, আগে সরকার ও সরকারি সংস্থার জন্য কৃষকের জমি অধিগ্রহণ করা হতো, এখন অসংখ্য ব্যাপারে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এবং সে সবের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ প্রধানত সড়ক - পরিবহন নির্ভর। কিন্তু সে দেশে বেশিরভাগ সড়ক দুই লেনের। ভারতে চার - ছয় - আট লেনের সড়ক প্রধানত টোল আদায়ের জন্য, এই সড়কের সঙ্গে দুই পাশের গ্রামগুলির যোগাযোগের ব্যবস্থার অভাবে গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও খারাপ হয়। এই প্রশস্ত সড়কগুলি দ্রুতগামী পরিবহনের জন্য জমি দিয়ে কৃষকেরা নিঃস্ব হয়ে হারিয়ে যাবে কেন? উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বালিয়া থেকে দিল্লির অদূরে নয়ডা পর্যন্ত আট লেনের সড়ক নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চাষীদের লাভ হবে না, এমন প্রকল্পের জন্য তারা জমি দেবে কেন? প্রস্তাবিত সড়ক বরাবর এলাকার লোকেরা ভোট দিয়ে মায়াবতীর দলকে হারিয়ে দিয়েছে। মেচেদা - হলদিয়া সড়ক চার লেনের করার প্রস্তাব কৃষকেরা বাতিল করেছে তমলুকের সিপিএম প্রার্থী লক্ষ্মণ শেঠের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে। মিটার গেজ রেলকে ব্রডগেজে রূপান্তরের জন্য কৃষিজমি দরকার থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ধনী দেশগুলিতে যদি মিটার গেজ ট্রেন চালু থাকতে পারে, ভারতেও দুই ধরণের রেলপথ থাকতে আপত্তি কেন? মিটার গেজের ট্রেনের রেল - লাইন সমেত সব যন্ত্রপাতি বিক্রির মাধ্যমে টাকা রোজগারের যে সুযোগ রেলমন্ত্রী জাফর শরিফের আমলে শুরু হয়েছিল, সেটা এখনও বজায় আছে। নতুন বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণের পিছনেও আছে টাকা রোজগারের ধান্দা। হায়দ্রাবাদে বেগমপেট বিমান বন্দর ও বাঙ্গালোর শহরের বিমানবন্দর থাকতে দুটি নতুন বিমান বন্দর করার দরকারই ছিল না। কয়েক হাজার কৃষকের জমি বেঁচে যেত। তৃতীয়ত, ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনেকবার সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু জরুরি অবস্থার প্রয়োজন দেখিয়ে জমি অধিগ্রহণের জন্য আইনের ১৭নং ধারা এবং কম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আইনের ১১নং ধারা বদলানো হয় নি। জেলার কালেক্টর ইচ্ছামতো ক্ষতি-পূরণের পরিমাণ স্থির করতে পারেন, এটাই আইন। অধিগ্রহণের সময় যে দাম সরকার দেবে, তার বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে কোনো লাভ হয় না। কারণ আইন তার পক্ষে নয়। সম্প্রতি বেদিক গ্রামে ফুটবল খেলার সময়ে একজনের মৃত্যুর পর রাজারহাট ও বেদিক গ্রামের জমি অধিগ্রহণের কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে। রাজারহাটে আইনের ১৭ধারা অনুসারে জমি অধিগ্রহণ ছিল একেবারেই বেআইনি। গ্রামগুলিকে 'উপনগরী' ঘোষণা করলে জমির ঊর্দ্ধসীমার আইন এড়ানো যায়, বেদিক গ্রামের জমি-দখলে কেলেঙ্কারিতে তা জানা গেল। ১৯৬৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করে আইনে ৩১ (১) ধারা যোগ করে কম করে কৃষিজমির মালিকদের উৎখাতের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৭ ধারা প্রয়োগ করে সরকার ৩১ (১) ধারাকে চাপা দিয়েছে।

আইন সংবিধান বিরোধী কেন?

ডঃ বি. ডি. শর্মা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইংরেজ শাসনে ভারতীয় নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। তাই ১৮৯৪ সালের জমির মালিকের অধিকারের কথা ভাবাই হয় নি। টাকা দিয়েই জমির মালিকানা কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাগরকিদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। জনতা পার্টির সরকারের আমলে আমরা সেই অধিকার আবার ফিরে পাই। যাই হোক, রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'সমস্ত মানব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার। জীবনের অধিকারের অর্থ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকা। মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার দুটি প্রাথমিক শর্ত হল ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।' রিপোর্ট আরও আছে, জমি নিয়ে লড়াইয়ের কারণ দুটি অধিকার— একদিকে বেঁচে থাকার অধিকার, অপরদিকে সম্পত্তির অধিকার। বেঁচে থাকার অধিকার কেবল মূল নয়, সম্পত্তির অধিকারের চেয়ে অনেক উঁচুতে। বর্তমানে অধিগ্রহণে কেবল আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু জমি হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও চলে যাচ্ছে। বনে বসবাস না করলেও আদিবাসীরা বনের সামাজিক সম্পদের অধিকারী। বনের কেন্দুপাতা সংগ্রহ করে আদিবাসীরা জীবিকা সংবহন করে। বনের ফলমূল তাদের খাদ্য। ১৮৯৪ সালের জমির অধিগ্রহণ আইন অনুসারে বন-এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের নাম রেকর্ড করা না থাকলে তার ক্ষতিপূরণের অধিকারী নয়। সামাজিক সম্পদ হিসাবে বনের ওপর আদিবাসীদের অধিকার স্বীকৃত। নর্মদা ট্রাইব্যুনালের রায় অনুসারে সর্দার সরোবর প্রকল্পে উৎখাত আদিবাসীদের বিকল্প জমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা। কিন্তু গুজরাট সরকার সরকারি নথিতে নাম না থাকা আদিবাসীদের পুনর্বাসন দিতে অস্বীকার করেন অথচ মহারাষ্ট্রের মণিবেলী গ্রামে আদিবাসীদের ছয় পুরুষ বসবাস ও চাষবাস করছিল। কিন্তু সরকারি নথিতে তাদের নাম ছিল না। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন জমি অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তালিকার অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনেক আদিবাসী এলাকায় এবং অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুরে জমির মালিকানা গ্রামের। ফলে

জলধারা, চওড়া সড়ক বা রেললাইনের কিংবা সরকারি অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণ করলে কাউকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। অরুণাচল সরকার ১৯৯০ দশকে ৪০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রাঙ্গানদী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে। ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের জন্য বিক্ষোভ সরকার কঠোর হাতে দমন করে। ঐ রাজ্যে বর্তমান কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ৩০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ চুক্তি করেছে। অরুণাচল সিটিজেনস রাইটস তথ্য অধিকার আইন অনুসারে জানতে পেরেছে যে, ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য সরকার ১০৩টি প্রকল্পে এবং গত লোকসভা নির্বাচনের পাঁচ মাস আগে ৩১টি যৌথ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সই করেছে এবং কয়েক কোটি টাকা অগ্রিম পেয়েছে। (দ্য স্টেটম্যান, ২ সেপ্টেম্বর , ০৯)। এই সব প্রকল্পে উৎখাত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তাই তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন উঠছে না। অরুণাচলে না হয়ে অন্যত্র গিয়ে নতুন গ্রাম গড়বে। কিন্তু মণিপুরে সে সুযোগও নেই। পাহাড়ে থাকে নাগা-কুকিরা, সমতলের বাসিন্দা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মেতেইদের পাহাড়ে জমি কেনার অধিকার নেই। ভারত সরকারের প্রস্তাবিত চার/ছয়/আট লেনের বার্মা - মুখী সড়ক এবং তেপাইমুখী ড্যামের জন্য জমি হারাবে সমতলের মেতেইরা। তাঁরা ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন কোনোটাই পাবেন না। ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনে এই জটিল সমস্যার সমাধানের কোনো সুযোগ নেই।

আইনের ১৭ ধারা ও ১১ ধারা বাতিল না করলে জরুরি প্রয়োজন দেখিয়ে কম টাকায় সড়ক, বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, উপনগরীর নাম করে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণের সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। 'সেজ' প্রকল্পে কৃষিজমি অধিগ্রহণে বাধা পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উৎখাত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য আইনের সংশোধনে উদ্যোগী হয়েছে। ঐ বিলে বেসরকারি উদ্যোগপতিরা ৭০ শতাংশ জমি কৃষদের নিকট থেকে কিনলে সরকার অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করে দেবে। তৃণমূল কংগ্রেস সংগতভাবে আপত্তি তুলেছে, সরকার বেসরকারি ব্যবসায়ীদের জন্য জমি অধিগ্রহণ করবে কেন? তপসিয়ার চামড়া-শিল্প, গার্ডেনরীচ ও মহেশতলা সন্তোষপুরের পোষাক - শিল্পের জন্য তো সরকার কোনো জমি অধিগ্রহণ করে নি। কিন্তু সমস্যা কেবল শিল্পের প্রয়োজনে কৃষিজমি অধিগ্রহণের নয়, সড়ক, বিমানবন্দর, উপনগরী, সরকারি আবাসন তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের নিয়ন্ত্রণের বা উৎখাত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধনের ব্যাপারে সরকার ভাবছে বলে মনে হয় না। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ভারতে ও বহুদেশে কোনো প্রকল্পে উৎখাত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের আন্দোলনের প্রেরণা দিয়েছে, বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণদান নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু শহর উন্নয়নের জমি অধিগ্রহণ আইনের বিরোধিতা কলকাতা শহরেই হয়েছে ১৯৬১ সালে। লবণহ্রদ এলাকা ভরাটের আগে ঐ বিলে এলাকায় বসবাস করতে থাকা তপসিলি সম্প্রদায়ের কৃষক ও মৎসজীবীরা। দুটি সংগঠন সরকারি নীতির বিরোধিতা করে। কিন্তু সংবাদপত্রে কোনো খবর হয় না। প্রয়াত শক্তি সরকার ও প্রেমতোষ ঘোষ পরিচালিত সংগঠন উৎখাত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের দাবিতে লবণ - হ্রদ প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৬১ সালে উৎখাত মৎস্যজীবী ও কৃষকদের মীনাখাঁ এলাকায় পুনর্বাসনের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীরা ঐ প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে উদ্যোগী হন নি। উৎখাত ব্যক্তিদের বংশধরেরা এখন দত্তাবাদ - বস্তির বাসিন্দা। তাদের সল্টলেক উপনগরীতে পুনর্বাসনের কোনো চেষ্টা হয় নি। কসবার পূর্বে ইস্ট ক্যালকাটা টাউনশিপ পরিকল্পনা হয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে। বিশ্বব্যাঙ্ক উৎখাত গরিবদের পুনর্বাসনের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর শহর - উন্নয়ন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর ঐ টাকা অন্যভাবে খরচ করেন। এবং জমি অধিকার আইনের ১৭ এবং ১১ ধারা প্রয়োগ করে এলাকা দখল করেন। কিন্তু জমি থেকে উৎখাত ব্যক্তিরা এলাকায় সন্ত্রাসের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারে নি। তাই এখনও অনেকে পুনর্বাসনের সুযোগ পায় নি।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। Report of the commissioner for - Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Twenty Nineth Report (1987-89), Goverment of india.

২। John K. Galbraith : The Nature of Mass poverty. Harvard University Press, 1979.

৩। Lady Hope : General Sir arthur Cotton, Institure of Engineers (India) 1964.

৪। প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — জমি অধিগ্রহণ। দৈনিক বর্তমান ৬/৯/২০০৯

৫। UN Human Rights Commission Forced Eviction and Humman Rights, Fact Sheet No 25.